স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা পেশাদারি নাটক: এলিট উপেক্ষার অন্তরালে

- অর্পিতা দাস [২]

'পেশাদারি' শব্দটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাংস্কৃতিক বুদ্ধিজীবী মহলের কিছুটা অবজ্ঞা এবং কিছুটা উপেক্ষা। কিন্তু নাট্যচর্চার অন্যতম দিক এই পেশাদারি নাটক --- সেকথা অস্বীকার করা যায় না।

বাঙালি সমাজে মধ্যযুগের যাত্রা এবং নাটপালাগীত ইত্যাদির চর্চায় যে নাটকীয়তা ছিল সেই ধারা বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছে এদেশে ইংরেজ আগমনের পরে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে এদেশে আগত ইংরেজরা কিছু কিছু নাট্যালয় স্থাপন করে নাটক অভিনয় করতেন। সেসব নাটক অভিনীত হত ইংরেজি ভাষাতেই। কিছু ইংরেজি শিক্ষিত ধনী বাঙালি সেই নাটক দেখার সুযোগ পেতেন। এঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোনো কোনো ধনী বাঙালি নিজেদের উদ্যোগে অর্থব্যয় করে ইংরেজি নাটক অভিনয় করাতেন। বাঙালির প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর এর দ্বারোদঘাটন হয়। এর পর থেকে ধীরে ধীরে নাট্যচর্চা ও নাটক অভিনয়ের প্রতি বাঙালির আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে; যা বাংলা ভাষায় নাটক দেখার আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়।

হেরাসিম লেবেডেফ-এর প্রচেষ্টায় ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর প্রথম যে বাংলা নাটক (*কাল্পনিক সংবদল, The Disguise*-এর বাংলা অনুবাদ) অভিনীত হয়েছিল সেটি টিকিট বিক্রিই করেই হয়েছিল। এ সম্পর্কে ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর *ক্যালকাটা গেজেট*-এ বিজ্ঞাপন বের হয়। বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ---

BENGALLY THEATRE
NO. 25, DOOMTULLAH
MR LEBEDEFF
Has the honour to acquaint the Ladies and Gentlemen of the Settlement,
THAT HIS
THEATRE
WILL BE OPENED

---

[২] অধ্যাপিকা, পঞ্চকোট মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া।

TO-MORROW, FRIDAY, 27TH INST.
WITH A COMMEDY,
CALLED
THE DISGUISE
The Play to commence at 8 o'-Clock Precisely.

Tickets to had at his theatre
Boxes and Pit, ...Sa. Rs. 8
Gallery.....Sa. Rs. 4

কিন্তু তখনও পেশাদারি নাটক বলতে যা বোঝায় তার সূত্রপাত এদেশে ঘটেনি। অতঃপর ধনী বাঙালিরা নিজেদের প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষায় নাট্যচর্চার একটি ধারা গড়ে তুলেছিলেন এদেশে; যার সূত্রপাত ঘটেছিল শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র সেনের বাড়িতে *বিদ্যাসুন্দর* অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ অক্টোবর নাট্যাকারে *বিদ্যাসুন্দর* অভিনীত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং তার পরেও বাংলায় নাট্যচর্চার যে পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল তা পেশাদারি নয়; ধনবান ব্যক্তিদের আগ্রহের ফল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি আশুতোষ দেবের (সাতু বাবু) বাড়িতে *শকুন্তলা*-র অভিনয় হয়; ওই বছরেরই মার্চ মাসে নূতন বাজারের রামজয় বসাকের বাড়িতে অভিনীত হয় রামনারায়ণ তর্করত্নের *কুলীনকুলসর্বস্ব* নাটক। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রামনারায়ণ অনূদিত *রত্নাবলী*-র প্রথম অভিনয় হয়। ১৮৫৯ সালে ২৩ এপ্রিল মেট্রোপলিটন থিয়েটারে উমেশ চন্দ্র মিত্রের *বিধবা বিবাহ* নাটক অভিনীত হয়। প্রকৃতপক্ষে ধনী ব্যক্তিদের আগ্রহে গড়ে ওঠা নাট্যশালাগুলিতে বাংলা রঙ্গমঞ্চের ভিত্তি স্থাপিত ও দৃঢ় হয়। এক্ষেত্রে পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যশালা, শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েটরিক্যাল সোসাইটি, জোড়াসাঁকো থিয়েটার, বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই নাট্যচর্চা পেশাদারি নয় এবং অবশ্যই শখের থিয়েটার। এগুলিতে টাকা জুগিয়েছেন ধনী পৃষ্ঠপোষক, নাটকের স্থান করে দিয়েছেন তাঁরাই। তাঁদেরই উৎসাহে নাটক লিখেছেন বিদ্বান ব্যক্তিরা, পুরুষ চরিত্রগুলিতে অভিনয় করতেন শিক্ষিত উচচবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বাড়ির সদস্যরা।

কিন্তু এইসব নাটক অভিনয়ের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন বা পেশাদারিত্বের কোনো সংস্পর্শ ছিল না এমন বলা যাবে না। নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন বারাঙ্গনা পল্লির মেয়েরা। নিশ্চিতভাবেই তাঁরা এই অভিনয় অর্থের বিনিময়ে করতেন। দৃশ্যতই মঞ্চসজ্জা, নেপথ্য বাদন, সংগীত, আলোক সম্পাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে যাঁরা কাজ করতেন তাঁদেরও পারিশ্রমিক দিতে হত। কাজেই নাটকের সঙ্গে পেশার সংযোগ এই সময়েই ধীরে ধীরে দেখা দিতে শুরু করেছিল। বাংলা নাটক হয়ে উঠতে লাগল সাধারণ মানুষের অত্যন্ত শক্তিশালী এক বিনোদন। এই

আগ্রহেরই ফল ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়। যেখানে প্রথম থেকেই টিকিট কেটে দর্শকেরা নাটক দেখতে আসতেন।

সাধারণ রঙ্গালয়ের যুগের এই নাট্যধারাকে পেশাদারি নাটক ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। অভিনেতা-অভিনেত্রীসহ থিয়েটারের পরিচালক ও ম্যানেজারদের পারিশ্রমিক ছিল; প্রেক্ষাগৃহের ভাড়া ছিল; দর্শকদের টিকিট কেটে নাটক দেখতে হত। নাট্যদলগুলির মধ্যে ছিল পারস্পরিক প্রতিযোগিতা। কিন্তু এই পেশাদারি নাটকের ধারা থেকেই বাংলার নাট্যসাহিত্যের প্রভূত বিকাশ কি সাধিত হয়নি? বাংলার নাট্যসাহিত্য গড়ে উঠেছে এই পেশাদারি নাটকের পর্বেই। তারপর থেকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধ ব্যাপ্ত করে যে নাট্যধারা বাংলার নাট্য-দর্শকদের চাহিদা পূরণ করেছে তা হল পেশাদারি নাটক। তার পরেও পেশাদারি নাটক চলেছে বেশ কিছুদিন।

উনিশ শতকের শেষ তিন দশক এবং বিশ শতকের প্রথম দুই দশক পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরের যে নাট্যচর্চা তাকে কেবলই পেশাদারি বলে দিলে কিন্তু তার গুরুত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা যাবে না। এই পেশাদারিত্বের সঙ্গে দর্শকের চাহিদা পূরণের সম্পর্ক অবশ্যই ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে সামাজিক আদর্শ, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধের সম্পর্ক ছিল না --- একথা বলা যাবে না। সমাজে যখন পণপ্রথা এবং বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধতা যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান তখন বাংলা নাট্যমঞ্চে অভিনীত হয়েছে বিধবা বিবাহের পক্ষে এবং পণপ্রথাকে নিন্দা করে লিখিত বাংলা নাটক (উমেশচন্দ্র মিত্রের *বিধবা বিবাহ*, গিরীশচন্দ্র ঘোষের *বলিদান* প্রভৃতি)। কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে লেখা নাটক রামনারায়ণ তর্করত্নের *কুলীনকুলসর্বস্ব* (১৮৫৪) হয়ে উঠেছে ইতিহাসেরই অঙ্গ। যে বড়োলোকেরা নাটকের জন্য টাকা দিচ্ছেন তাদেরই ব্যঙ্গ করে লেখা হচ্ছে নাটক (মধুসূদন দত্তের *বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ*, দীনবন্ধু মিত্রের *সধবার একাদশী* প্রভৃতি)। পেশাদারি নাটকের যুগের নাটক *নীলদর্পণ* ব্রিটিশ শাসককেও কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

উনিশ শতকের এই পেশাদারি নাটকেই ধ্বনিত হয়েছিল বাঙালির ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিবাদ। প্রেক্ষাগারের মালিক, পরিচালক, অভিনেতা সকলেই কারারুদ্ধ হওয়ার বা যে কোনো রকমের শাস্তির ঝুঁকি নিতে পিছপা হননি। পেশাদারিত্বের জনরঞ্জনী প্রবণতার পাশাপাশি তাঁরা ভেবেছিলেন দেশের ও সমাজের মঙ্গলের দিকটাও। বাংলার পেশাদারি নাটকে তাই সমাজসংস্কার ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়েছিল।

বাংলার নাট্যসাহিত্য, অভিনয় শিল্প, সংগীত প্রতিভা এবং নারী ব্যক্তিত্ব এই সব কিছুরই বিকাশে সহায়ক হয়ে উঠেছিল উনিশ শতকের এবং দুই শতকের সন্ধিক্ষণের বাংলা পেশাদারি নাটক।

কিন্তু স্বাধীনতা-পূর্ব তিনদশকে পেশাদারি নাটকের গুরুত্ব অনেকটা কমে যায়। তার একটি কারণ ছিল ভারত ক্রমেই স্বাধীনতা আন্দোলনে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। সেই সময়ে নাট্যচর্চায় আলাদা করে মন দেবার মানসিকতাও কমে এসেছিল। তবু মনে রাখতে হবে শিশির ভাদুড়ি (১৮৮৯ -১৯৫৯), অহীন্দ্র চৌধুরী (১৮৯৫ -১৯৭৪), নির্মলেন্দু লাহিড়ী (১৮৯১ - ১৯৫০) প্রমুখের উত্থান এই সময়েই। একটি ভালো গল্পকে নাটকের রূপ দিয়ে রুচিশীল দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করবার শৈল্পিক আকাঙ্ক্ষা শিশির ভাদুড়ির মতো কেউ কেউ ধরে রেখেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এইসময় রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনীত হয়েছে। যোগেশ চন্দ্রের নাটকের পাশাপাশি উত্থান ঘটেছে মন্মথ রায়ের মতো নাটককারের। পেশাদারিত্ব এই সব নাটকে কোনো লঘু রুচির প্রবণতা নিয়ে আসেনি। কাজেই পেশাদারিত্ব বা পেশাদার শব্দটিকে কোনো অর্থেই তুচ্ছ করা উচিত নয়। যে কোনো কর্মক্ষেত্রে টিকে থাকতে গেলে আর্থিক সংস্থানের প্রয়োজন হয় একথা অস্বীকার করা অনুচিত। তা সত্ত্বেও বিশ শতকের চারের দশক থেকে যে গণনাট্য আন্দোলন দেখা দিল তার চরিত্র ছিল আলাদা। তখন দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছে। সমাজ মানসের একাংশে প্রতিষ্ঠত হয়েছে সাম্যবাদী মতাদর্শ।

গণনাট্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপট রূপে সেইসময়ের ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনৈতিক পরিমন্ডলের অস্থিরতা এবং বিপর্যয়ের দিকটিও জেনে নিতে হবে।

প্রথম মহাযুদ্ধ ঘটেছিল বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ক্ষমতাবৃদ্ধির লোভে। ইউরোপে গড়ে উঠেছিল দুটি বিরোধী শিবির। ভারতকে যোগ দিতে হয়েছিল ব্রিটেনের পক্ষে কারণ ভারত ছিল ব্রিটেনের উপনিবেশ। সেই সময় থেকেই বাঙালি আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হতে বাধ্য হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই ফ্যাসিবাদের রাষ্ট্রনীতি উদ্ভূত হল। মুসোলিনি শাসিত ইতালিতে এই উগ্র জাতীয়তাবাদী স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতির উদ্ভব ঘটেছিল বিশ শতকের তৃতীয় দশকের গোড়ায়। জার্মানিতে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে হিটলার ক্ষমতায় আসবার পর আগ্রাসী ফ্যাসিবাদ অনেক পরিমাণে বর্ধিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত জার্মানি এই নিষ্ঠুরতার মধ্যেই অনুভব করে জাতীয় গৌরবের স্বাদ।

কিন্তু ততদিনে উদ্ভব ঘটেছে সমাজতন্ত্রবাদের। সমাজতন্ত্রবাদী মতাদর্শে বঞ্চিত নির্যাতিত অসহায়ের পাশে দাঁড়াবার যে আদর্শ ছিল তা সর্বার্থে ফ্যাসিবাদ বিরোধী। বঙ্গীয় রাজনীতিতে ১৯২০ থেকে ১৯২৫-এর মধ্যে সাম্যবাদী চিন্তার প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভব (১৯২৫) হয়। এই সমাজতন্ত্রবাদী রাজনৈতিক দল এবং সাম্যবাদে বিশ্বাসী লেখক ও শিল্পী সমাজ তাঁদের পুঁজিবাদ বিরোধী এবং আগ্রাসন বিরোধী আদর্শ নিয়ে সর্ব-অর্থে ফ্যাসিবাদের আগ্রাসন প্রতিরোধ গড়তে চেয়েছিলেন। বিশ শতকের চারের দশকে চলেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ইতালি, জার্মানি, জাপানের সম্মিলিত ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক মনোভাবের

এবং শোষিত শ্রেণির পাশে দাঁড়াবার সংকল্পের আদর্শ সামনে রেখে সাম্যবাদীরা সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন পৃথিবীর সর্বত্র এবং ভারতেও। তাঁদেরই প্রয়াসে গড়ে উঠেছিল গণনাট্য সংঘ।

এই গণনাট্য আন্দোলনের সময় ছিল ১৯৪৩ -৪৪ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত। স্বাধীনতার ঠিক পরেই গ্রুপ থিয়েটারের মানসিকতার সঙ্গে বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্বদের মতভেদ দেখা দিতে লাগল। গণনাট্য সংঘের আদর্শের মধ্যে রাজনৈতিক ভাবনা ছিল সংমিশ্রিত। সেজন্য নাটক কিছুটা প্রচারধর্মী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রকৃত শিল্পী কখনও কোনো ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে থেকে সৃষ্টি করতে পারেন না। তাঁর প্রয়োজন হয় স্বাধীন চিন্তনের পরিসর। প্রকৃত শিল্পীর উদ্দেশ্যও কখনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক এবং সমাজতাত্ত্বিক আদর্শের প্রচারমুখ হয়ে নিজের কাজ শেষ করে না। প্রকৃত শিল্পীর উদ্দেশ্য একটাই। তা হল নাট্যশিল্পে জীবনের প্রতিরূপ নির্মাণ করা। তারই মধ্যে দিয়ে বাস্তবের চিত্রনের অভ্যন্তর থেকে মানবিকতাবোধের প্রতিষ্ঠা ঘটবে --- এমনই অভিপ্রায় থাকে প্রকৃত শিল্পীর। তাছাড়াও যিনি শিল্প-স্রষ্টা --- নাটকের ক্ষেত্রে নাটককার ও পরিচালক --- তিনি অতি অবশ্যই নিজের সৃষ্টির সুন্দরতম অবয়বটি নির্মাণ করতে চান। কোনো উদ্দেশ্যমূলক বাঁধা পথে তাঁর সেই অভিপ্রায় পূর্ণ হয় না। তাই ১৯৪৮ থেকেই দেখা গেল শম্ভু মিত্র নিজেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন *বহুরূপী*। পাশে ছিলেন উৎপল দত্ত। যদিও উৎপল দত্তের রাজনৈতিক কমিটমেন্ট স্পষ্টই ছিল। তাসত্ত্বেও শেক্সপিয়র অনুরাগী উৎপল দত্ত পাশ্চাত্য নাটকের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে ভিন্ন ধারার এক উপভোগ্য নাট্যপ্রবাহ মুক্ত করেছিলেন বাংলার দর্শকদের জন্য। এখান থেকেই গড়ে উঠল কলকাতার গ্রুপ থিয়েটার। কলকাতাতেই তার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটলেও এখন তা ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র এবং বাংলাদেশেও। ১৯৪৮ থেকে একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকেও গ্রুপ থিয়েটারের সেই ধারা অব্যাহত আছে। যদিও আর্থিক সংকট এই ধারার নিত্যসঙ্গী। তাসত্ত্বেও কিছুটা সরকারি সহায়তায় এবং কিছুটা নিজেদের আন্তরিক প্রয়াসে এই নাট্য দলগুলি নিজেদের নাট্য আন্দোলন এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রুপ থিয়েটার --- দলের নাম ও প্রতিষ্ঠা বৎসর উল্লেখ করছি --- *বহুরূপী* (১৯৪৮), *লিটল থিয়েটার গ্রুপ* (১৯৫৫), *শৌভনিক* (১৯৫৭), *সুন্দরম* (১৯৫৭), *থিয়েটার ইউনিট* (১৯৫৮), নান্দীকার (১৯৬০), *থিয়েটার ওয়ার্কশপ* (১৯৬৬), *চেতনা* (১৯৭২)। এছাড়াও আছে *শূদ্রক, সায়ক, গান্ধার, অন্য থিয়েটার, নান্দীপট, চুপকথা* ইত্যাদি। কলকাতা ছাড়াও কল্যানী, চন্দননগর এবং উত্তরবঙ্গের বালুরঘাট গ্রুপ থিয়েটারের ধারার বিশিষ্ট নাম। বাংলায় কয়েকজন স্মরণীয় নাট্যব্যক্তিত্বের নামও জড়িয়ে আছে গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে যেমন শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, কেয়া চক্রবর্তী, স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত, অরুণ মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, তৃপ্তি মিত্র, কুমার রায়, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, গৌতম হালদার, দেবশঙ্কর হালদার এবং আরও অনেকে।

কিন্তু এই নিবন্ধে আমরা একটু অন্যদিকে তাকাতে চাই। আমরা বলতে চাই পেশাদারি নাটকের কথা, যে পেশাদারি নাটকের ধারাটি বাংলার সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক বিনোদনের রুচিকে তৃপ্ত করে এসেছে দীর্ঘকাল। একথা অস্বীকার করার নয় যে, গ্রুপ থিয়েটার বিশেষভাবে উচচশিক্ষিত আন্তর্জাতিক রুচিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের কাছে সমাদৃত হয়। যে জনসাধারণ অর্থাৎ কমন পিপল-এর কাছে বাংলার যাত্রা এবং মধ্যমানের চলচিচত্র প্রধান বিনোদন বলে বিবেচিত হয় তাদের জন্যই স্বাধীনতা-উত্তর কালে পেশাদারি থিয়েটার চলতে শুরু করেছিল। এই ধারাটি অবশ্য গণনাট্য আন্দোলনের সময়ও বন্ধ হয়নি। স্বাধীনতার পর ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৭৫-৮০ পর্যন্তও বাংলার পেশাদারি থিয়েটার তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল যথেষ্ট সমর্থভাবেই। এমন দেখা যেত যে ছুটির দিনে সপরিবার ও সবান্ধব মফঃস্বলের দর্শক সকালে কলকাতায় এসে কালীঘাটে পুজো দিয়ে চিড়িয়াখানা ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখে উত্তর কলকাতার কোনো এক নাট্যশালায় একটি নাটক দেখে বাড়ি ফেরার ট্রেন বা বাস ধরতেন। ১৯৬০-৬৫ পর্যন্ত এই দৃশ্য ছিল খুবই সুলভ।

এই পেশাদারি নাট্যচর্চাকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করা অনুচিত। প্রথমত, বাংলার সাধারণ মানুষের নাট্য রুচিকে সর্বতোভাবে তৃপ্ত করত এই নাট্যধারা। এখানে থাকত একটি সরল পারিবারিক গল্প; থাকত পারিবারিক সংকট এবং সেই সংকট থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার খানিকটা ইচছাপূরক ধরনের কাহিনি। থাকত বাবা-মা, পুত্র-কন্যা, পুত্রবধূ, বন্ধু ইত্যাদি সম্পর্কগুলির স্বাভাবিক চিত্রন, যা মানুষের সাধারণ সামাজিক প্রত্যাশাকে তৃপ্ত করত। দ্বিতীয়ত, এই নাটকগুলি উপভোগ করবার জন্য কোনো বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হত না; যা গ্রুপ থিয়েটারের দর্শকদের ক্ষেত্রে প্রত্যাশা করা হত। তৃতীয়ত, এই নাটকগুলির অভিনয়ের ধরন ছিল প্রথাসিদ্ধ, কখনও কিছুটা চড়াদাগেরও, যা সাধারণ দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্য হত। চতুর্থত, প্রতীক, রূপক ইত্যাদি আঙ্গিক এগুলিতে থাকত না। পরিবর্তে সাধারণ লোকপ্রিয় গান এবং কখনও বা নৃত্যদৃশ্যের আয়োজনও থাকত। মনে পড়তে পারে বিখ্যাত ক্যাবারে শিল্পী শেফালি এই পেশাদারি নাটকের মঞ্চেই অবতরণ করতেন। তাঁর শিল্পকুশলতাকে সম্মান জানিয়েছিলেন স্বয়ং সত্যজিৎ রায় 'সীমাবদ্ধ' চলচিচত্রে। পঞ্চমত, এই পেশাদারি নাটকগুলিতে অভিনয়ের মান কিন্তু তুচছ করার মতো হতো না। চলচিচত্রের প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা প্রায়শই এইসব নাটকের মঞ্চে আসতেন। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুব্রতা প্রমুখ শিল্পী অভিনয় করতেন পেশাদারি মঞ্চে। গীতা দে, কেতকী দত্ত, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ শক্তিমান অভিনেতৃবর্গ পেশাদারি নাটকে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং বাংলার শিল্পজগতে নিজেদের আসন স্থায়ী করে নিয়েছেন। শেষকথা হিসেবে বলা যায় এই পেশাদারি নাটক বহু মধ্যবিত্ত পরিবারের গ্রাসাচছাদন জোগাবার কাজেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বিশেষত পেশাদারি মহিলা নাট্যশিল্পীদের একটি গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল যাঁরা নিয়মিত প্রেক্ষাগৃহের নাটক ছাড়াও ক্লাবে মহিলা চরিত্রে অভিনয়

করে সংসার চালাতেন। কারণ ছয়ের দশক পর্যন্তও বাঙালি সমাজে মুক্তমঞ্চে অভিনয় করবার মতো মহিলা সহজে পাওয়া যেত না।

এই পেশাদারি নাটকের ধারা বুদ্ধিজীবী এবং তথাকথিত উচচতর সংস্কৃতিমনস্ক নাট্যসমালোচকদের কাছে চিরকাল উপেক্ষিত হয়েছে। যেমন উপেক্ষিত হয়ে থাকে তথাকথিত বাণিজ্যিক চলচিচত্র। কিন্তু বাণিজ্যিক চলচিচত্র এবং 'আর্ট' ফিল্ম এর মধ্যে যেমন সুনির্দিষ্ট কোনো সীমারেখা টেনে দেওয়া হয়নি তেমনই পেশাদারি নাটক এবং গ্রুপ থিয়েটারের মধ্যেও তেমন কোনো সীমারেখা নেই। পেশাদারি নাটকের মতোই পারিবারিক আখ্যান এবং প্রথাসিদ্ধ অভিনয়-রীতিও মাঝে মাঝেই গ্রুপ থিয়েটারের পরিচালকদেরও গ্রহণ করতে দেখা যায়। এই পেশাদারি নাট্য-ধারাকে অবহেলা করার অর্থ হল সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যবর্গীয় মানসিকতাকে অবজ্ঞা করা।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এই পেশাদারি নাট্যধারার অন্তর্গত কয়েকটি নাটকের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করছি--

- ❖ 'স্বর্গ হতে বরণ' --- নাটককার মহেন্দ্র গুপ্ত। প্রথম অভিনয় ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭। স্টার রঙ্গমঞ্চ। স্বাধীনতার ছয়মাস আগে প্রথম মঞ্চস্থ এই নাটকে তুলে ধরা হয়েছে দেশপ্রেমের বাণী।
- ❖ 'থামাও রক্তপাত' --- নাটককার জলধর চট্টোপাধ্যায়। প্রথম অভিনয় ২৯ নভেম্বর ১৯৪৭। মিনার্ভা থিয়েটার। দাঙ্গাবিরোধী এই নাটকে সমকালের সাম্প্রদায়িক সংকট থেকে উত্তরণের প্রার্থনা জানানো হয়েছে।
- ❖ 'পরিচয়' --- নাটককার জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রথম অভিনয় ১০ আগস্ট ১৯৪৯। শ্রীরঙ্গম থিয়েটার। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের সন্তানকে স্বীকৃতি দেবার মানবিকতা এই নাটকে প্রতিফলিত। দেখা যাচ্ছে স্বাধীন ভারতের সংবিধান অনুসারে প্রতিটি মানুষকে মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করবার শুভ সমাজবোধ পেশাদারি মঞ্চে তুলে ধরা হয়েছে।
- ❖ 'কেরাণীর জীবন' --- নাটককার ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম অভিনয় ২৫ অক্টোবর ১৯৫২। মিনার্ভা থিয়েটার। স্বাধীনতার ঠিক পরেই আর্থিক সংকটে বিপর্যস্ত বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে লেখা এই নাটক। ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'স্ট্রীট বেগার' (প্রথম অভিনয় ২০ জুলাই ১৯৫৪) উল্লেখযোগ্য। পথের ভিখিরিকে নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করবার সাহস পেশাদারি নাটকই দিয়েছে, গ্রুপ থিয়েটার নয়।
- ❖ 'উল্কা' --- নাটককার নীহাররঞ্জন গুপ্ত। প্রথম অভিনয় ২ অক্টোবর ১৯৫৪। রঙমহল। কুৎসিত দর্শন পুত্রকে গ্রহণ করতে পিতা-মাতার দ্বিধা নিয়ে লেখা এই ট্রাজেডি নাটকটি অভূতপূর্ব জনপ্রিয় হয়।

- ‘এরাও মানুষ’ --- নাটককার সন্তোষ সেন। প্রথম অভিনয় ২২ ডিসেম্বর ১৯৫৫। মিনার্ভা থিয়েটার। জড়বুদ্ধি সম্পন্ন নির্যাতিত যুবকের প্রতি ভালোবাসা এই নাটকের অভিমুখ।
- ‘পিতাপুত্র’ --- নাটককার বিধায়ক ভট্টাচার্য। প্রথম অভিনয় ১৫ জানুয়ারি ১৯৫৫। মিনার্ভা থিয়েটার। স্নেহ ও কর্তব্যের দ্বন্দ্ব নিয়ে রচিত হয় এই নাটকটি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিধায়ক ভট্টাচার্যের ‘ক্ষুধা’ নাটকটিও (১৯ এপ্রিল ১৯৫৭। বিশ্বরূপা থিয়েটার) বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।
- ‘এক পেয়ালা কফি’ --- নাটককার ধনঞ্জয় বৈরাগী। প্রথম অভিনয় ১৯ ডিসেম্বর ১৯৫৯। রঙমহল। ঈর্ষা ও লোভের জন্য বন্ধু হত্যাকে অবলম্বন করে রচিত হয় এই সাসপেন্সধর্মী নাটকটি। নাটকটির বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য।
- ‘শেষলগ্ন’ --- নাটককার মনোজ বসু। প্রথম অভিনয় ৮ নভেম্বর ১৯৫৬। রঙমহল। এই নাটকের বিষয়বস্তু হল পণের জন্য দরিদ্র পরিবারের কন্যার বিবাহসমস্যা। দেখা যাচ্ছে, গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘বলিদান’ থেকে আরম্ভ করে স্বাধীন ভারতের পাঁচের দশকেও নাটকে বিষয়বস্তু হিসেবে গৃহীত হচ্ছে পণপ্রথা। পেশাদারি নাটকের এই দিকটি লক্ষণীয়।
- ‘পরমারাধ্য শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ’ --- নাটককার দেবনারায়ণ গুপ্ত। প্রথম অভিনয় ১৯ মার্চ ১৯৬০। স্টার থিয়েটার। এখানেও দেখি উনিশ শতকের সেই ভক্তিমূলক নাটকেরই অনুবর্তন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পেশাদারি নাটকের কার্যক্রমের অন্তর্গত নাটকের সঙ্গে উৎপল দত্ত, সলিল সেন, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নাটককারও কখনও কখনও যুক্ত হয়েছেন। এখানেই কিছুটা মুছে গেছে দুই নাট্যধারার পার্থক্য। পেশাদারি নাটকের রচয়িতাদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন নীহাররঞ্জন গুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য, দেবনারায়ণ গুপ্ত, মন্মথ রায় প্রমুখ।

সবশেষে চিন্তা করা যেতে পারে যে, পেশাদারি নাটক কেন বিশ শতকের সাতের দশকের পর আর নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারেনি। তার উত্তর সংক্ষিপ্ত, সরল এবং সকলেরই জানা। দূরদর্শনের আবির্ভাব এবং প্রতিটি মধ্যবিত্ত গৃহে এবং নিম্নবিত্তগৃহে দূরদর্শন যন্ত্র স্থান পাবার ফলে এই পেশাদারি নাটক আর মানুষের কাছে সেভাবে প্রয়োজনীয় বিনোদন হয়ে থাকতে পারেনি। সেই একই কারণে অল্প দামের টিকিটে যে চলচ্চিত্র গৃহগুলি সিনেমা দেখাতে পারত সেগুলিও সংকটে ভুগেছে এবং অনেকগুলিই বন্ধ হয়ে গেছে। এই পেশাদারি নাটক এবং অল্প দামের টিকিটের সিনেমা বাংলার মানুষকে যে বিনোদন সরবরাহ করত তার সবটাই বহুগুনিতভাবে এবং আরও কম খরচে বাড়িতে বসেই মানুষের পক্ষে পাওয়া সম্ভব

হচ্ছে। আধুনিক জীবনযাত্রার সময় স্বল্পতা এবং কর্মব্যস্ততাও এর অন্যতম কারণ। দূরদর্শনের অনুষ্ঠান সেখানে বাড়িতে বসেই উপভোগ করা সম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গের পেশাদারি নাটক ক্রমশই বিগত স্মৃতি হয়ে উঠেছে। এর জন্য কাউকে দায়ী করা নিরর্থক। কালপ্রবাহে এমন অনেক কিছুই বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাকে মেনে নিতেও হয়। কিন্তু পেশাদারি নাটককে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করা অনুচিত। এই নাট্যধারা বাঙালি সমাজের বিবর্তনের অনেকখানি ইতিহাসকে ধরে রেখেছে। স্বাধীনতা-উত্তর কালের প্রায় চার দশক জুড়ে এই পেশাদারি নাটক মধ্যবিত্ত সাধারণ বাঙালিকে বিনোদনের পাশাপাশি দিতে পেরেছে সমাজবাস্তবতার অনেকটা চিত্র এবং মানবিকতাবোধের উপলব্ধি। বরং বলা যেতে পারে যে, অধুনা বিলুপ্ত এই পেশাদারি নাটকের অনেক লক্ষণ এখন গ্রুপ থিয়েটারের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে।

সহায়ক গ্রন্থ :-

১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫-১৮৭৬)।* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ : কলকাতা। সপ্তম সংস্করণ।

২. মীরা বসু, ২০০০, *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পেশাদারী বাংলা থিয়েটার (১৯৪৭-১৯৭২)।* নির্মল সাহিত্য : কলকাতা।